অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue I, January 2026, PP. 16-22
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027

গুণময় মান্নার 'শালবনি': প্রেক্ষিত নকশাল আন্দোলন

সহদেব দাস
গবেষক, মেদিনীপুর কলেজ(অটোনমাস),পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা। কিন্তু রাজনীতি যেহেতু সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, তাই সাহিত্য আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেও রাজনৈতিক বিষয় উঠে আসা স্বাভাবিক। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। আর সেই সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ ও মানুষের কার্যকলাপের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় জড়িত রয়েছে। সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পাশাপাশি আঞ্চলিক ও পারিবারিক রাজনীতি লক্ষ্য করা যায়। নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক সমাজে আঞ্চলিক রাজনীতির প্রাধান্যই বেশি তবে কখনো কখনো সেই রাজনীতি বৃহত্তর জীবনেও প্রভাব ফেলেছে। যেমন- নকশাল আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি। আদিমকালে গোষ্ঠী নেতার নির্দেশ, রাজতন্ত্রে রাজার নির্দেশ, বুর্জোয়া শাসন, ঔপনিবেশিক শাসন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ ধরে রাজনীতির ধারণাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতির অলিন্দে রয়েছে ক্ষমতা দখলের লড়াই কিন্তু বর্তমানে রাজনীতির ধ্যান-ধারণা অনেক বেশি বিস্তৃত। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ও নীতি নির্ধারণকেই রাজনৈতিক বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাই নয় বরং মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে রাজনীতির প্রবেশ ঘটেছে। যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেবলমাত্র উচ্চবর্গের হাতেই ছিল। নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষ উচ্চবর্গের রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হতো। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি অভিমত সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হতো। কখনো কখনো তাদের নিজস্ব দাবি ও প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও দেখা যায়।

উপন্যাসে সরাসরি রাজনৈতিক তত্ত্বকে তুলে ধরা সাহিত্যিকের কাজ নয়, সাহিত্যিকের মূল লক্ষ্য রাজনৈতিক অভিঘাত থেকে জন্ম নেওয়া মানুষের জীবন সত্যকে তুলে ধরা। রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন বলেই তা সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হল রাজনৈতিক উপন্যাসে কি শুধুই রাজনীতির কথা উঠে আসে নাকি আরো কিছু? এর উত্তর একটি বিশেষ মতবাদ তুলে ধরা যেতে পারে-

"প্রচলিত ভাবে যেসব উপন্যাসকে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস বলি তার অধিকাংশ কনজাংচারাল, কোন রাজনৈতিক ঘটনা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ আদর্শের ছায়ায় তারা নির্মিত, কিন্তু গভীর স্তরের রাজনৈতিক উপন্যাস অর্গ্যানিক। প্রসঙ্গত কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ না থাকলেও একটি উপন্যাস রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে পারে। ইতিহাস ও সমাজের গভীর বোধ অন্ত:সলিলা ইতিহাসের প্রক্রিয়ার উন্মোচনে অভিজ্ঞান সন্ধানে, জন সমাজের নির্মাণ ভাঙ্গনের চেতনায় এমনকি ধর্মীয় জিজ্ঞাসা বহুমাত্রিক অন্বেষণেও উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক।"১

আলোচ্য গুণময় মান্নার উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ কখনো সরাসরি এসেছে কখনো বা কাহিনির প্রেক্ষিতে রাজনীতির কথা উঠে এসেছে। তথাকথিত রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে গুণাময় মান্নার উপন্যাসকে চিহ্নিত করা না গেলেও তাঁর উপন্যাসে সমকালীন রাজনীতির ছায়া পড়েছে। তিনি মার্কসীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হলেও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তিনি মূলত কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের কথা বলতে গিয়ে নানা প্রসঙ্গে নানা রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের কথা তার উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কিভাবে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের ওপর প্রভাব ফেলেছিল এবং তারা কিভাবে রাজনীতির সঙ্গে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েছিল সেই প্রসঙ্গই 'শালবনি' উপন্যাস প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে।

গুণময় মান্নার 'শালবনি' উপন্যাসে যেমন প্রান্তিক মানুষের কথা আছে তেমনি আছে তাদের জীবন সংগ্রামের চিত্র। সমাজে শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবী মানুষ বিশেষ সম্মান পায় না। তারা মূলত জোতদার, জমিদার, ঠিকেদারদের দ্বারা নানা ভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়। সেই লাঞ্ছনা-অপমান-বঞ্চনা এবং শোষণ থেকে মুক্তি পেতে শ্রমজীবী মানুষেরা কখনো কখনো ঐকবদ্ধ সংগ্রাম করেছে। কখনো জয় পেয়েছে কখনো হেরেছে কিন্তু তাদের এই সংগ্রাম থেমে থাকে নি। যখন সামন্ততন্ত্রের বা জমিদারি তন্ত্রের পতন ঘটছে চারিদিকে কৃষক শ্রমিকের জাগরণ ঘটছে, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হচ্ছে, নিজেদের দাবি নিয়ে তারা দরবার করছে এবং মার্কসবাদের প্রভাব এই বাংলার কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতাতেও এসে পড়েছে সেই সময় পর্বের বিভিন্ন দিক গুণময় মান্নার উপন্যাসে প্রকটিত হয়েছে।

গুণময় মান্নার 'শালবনি'(১৯৭৮) উপন্যাসে আছে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকা। ১৯৭০ এর নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যে সকল উপন্যাস লেখা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল এই 'শালবনি' উপন্যাস। ১৯৪৭ এ দেশভাগের সমস্যা, তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর আধুনিক শিল্পোৎপাদনের প্রতি মনোযোগের ফলে শিল্পে অগ্রগতি ঘটলেও কৃষির অগ্রগতি মন্থর হয়ে পড়ে। ফলে এক দশকের মধ্যে দেখা দেয় খাদ্য-সঙ্কট। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকটে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ। অপর দিকে ১৯৬২ সালে ভারত ও চীন সংঘর্ষ শুরু হলে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়। ১৯৬৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি দুটি দলে ভাগ হয়ে যায় চীন ও রাশিয়ার মতাদর্শকে কেন্দ্র করে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এই ঘটনাই নকশাল বাড়ির ঘটনাকে তরান্বিত করেছিল।

ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিক চিরকাল শোষিত হয়েছে। এই বঞ্চিত মানুষদের প্রতিবাদ নকশাল আন্দোলনের রূপ নেয়। নকশাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। চরমপন্থীরা নকশাল বাড়ি আন্দোলনকে সমর্থন করে ১৯৬৯ সালে সি. পি. (এম) থেকে বেরিয়ে এসে সি. পি. আই. (এম. এল) নামে নতুন পার্টি গঠন করে। তারা সংসদীয় গণতন্ত্রের পথকে বর্জন করে, আহ্বান জানায় সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের। তাদের এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন চারু মজুমদার। নকশালপন্থীদের মূল লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব ঘটানো। কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন গণতন্ত্র ও মুক্তির পথকে প্রশস্ত করতে চেয়েছিল।

নকশাল আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৬৭ সালে শিলিগুড়ি মহকুমায় নকশালবাড়ি এলাকায় সশস্ত্র কৃষকগণ, ধনী জোতদার ও চা বাগানের মালিকদের উদ্বৃত্ত জমি দখল করার জন্য লড়াই শুরু করে। নকশালপন্থীরা মনে করেছিল ভারতের জনসাধারনের প্রধান শত্রু হল- মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত শাসনবাদ, জমিদার শ্রেণি, আমলা তান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি, এই চার শ্রেণির শত্রুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উচ্ছেদ করতে পারলেই জনগনতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য অনিবার্য। সেজন্য তারা বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণিকে বিপ্লবের ঘাঁটি হিসাবে প্রস্তুত করে।

.

কিছু সময় ধরে নক্শাল আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করলেও এর প্রধান নেতা চারু মজুমদার যখন বন্দী অবস্থায় ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে মারা যাওয়ার পর এই গণআন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং ১৯৭৭-এ পুরোপুরি মুছে যায়। এই আন্দোলন সফল না হলেও এর প্রভাব পড়েছিলো সর্বত্র। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে গুণময় মান্নার 'শালবনি' উপন্যাস। কিভাবে নকশাল আন্দোলনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল গ্রাম বাংলার কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ও সেই সঙ্গে বনাঞ্চলের প্রান্তিক ও নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই 'শালবনি' উপন্যাসের ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

এই উপন্যাসের নিবিড় বিশ্লেষণে যেমন অখণ্ড মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থার সমূহ পরিচয় পাই সেই সঙ্গে জমিদার ও শাসক শ্রেণির অত্যাচার ও নিপীড়নের ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। সরকারের দমন পীড়ণ নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে অসহায় খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ছিল বিপন্ন। তারা তাদের দাবি আদায়ের জন্য ধীরে ধীরে সশস্ত্র বিপ্লবের কারণে সরকারের বিষ নজরে পড়েছিল। কিছু শিক্ষিত যুবক রাতের অন্ধকারে পুলিশের উপর হামলা চালানোর ঘটনা থাকলেও শেষে দেখা যায় সরকারের পুলিশ বাহিনীর কাছে তাদের পরাস্ত হতে হয়। 'শালবনি' উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় সিং বাবুদের মহল কাছারি এবং রাইস মিল সম্পর্কে অনেক কিছুই শাম্লীর জানা তবুও সে মায়ের অসুস্থতার জন্য বদলি কাজে যেতে বাধ্য হয়। এমনিতেই সিংবাবুর গোমস্তা তারকের নজর পড়েছে শাম্লীর ওপর। তারকের মতিগতি শাম্লীর ভালো লাগেনি। তবুও নিজেকে সংযত রেখে অন্নপূর্ণা রাইস মিলে কয়েকদিন কাজ করেছে, এই মিলটি সিং বাবু তার গিন্নি অন্নপূর্ণা নামে রেখেছে। ঔপন্যাসিক এখানে মিলের সমস্ত কাজ কর্মের ঘটনাটি বর্ণনা দিয়েছেন। কিভাবে ধান ভেজানো হয় সিদ্ধ হয় এবং ভাঙানো হয়। এই কাজে মেয়েদেরই বেশি দেখা যায়। রাইস মিল সম্পর্কে পাঠক অনেক কিছু অবগত হতে পারে। গণপতি সিং রাইস মিলের পাশাপাশি সুদের কারবারও করে থাকেন লেখক জানিয়েছেন-

"এসেছে সব অনেক কারণে, কেউ বন্ধকি খালাস করতে এসেছে, কেউ বন্ধক দিতে, সুদের টাকা জমা দিল কেউ, কিছু সুদ মুকুবের জন্য প্রার্থনা জানলো এইসব এখানকার প্রাত্যহিক কাজ।"২

সিংবাবুর সমস্ত হিসাব নিকাশ রাখে তারক হালদার কিন্তু রাইস মিলের ম্যানেজার হলো অভয় সরকার। ১৪ নম্বর পরিচ্ছেদে এসে পাঠক হঠাৎ করে একটি বীভৎস ঘটনার সাক্ষাৎ পায়। সিং বাবু বাড়ি ফিরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করছিল, এমন সময় কালি ঝুলি মেখে চারজন সিং বাবুকে ঘিরে ধরে। দুজন দুপাশে দাঁড়িয়ে, একজন পিছন দিকে দাঁড়িয়েছে, দুজনের মুখে মুখোশ ছিল। এমন দৃশ্য দেখে ধান সিদ্ধ করতে থাকা মেয়েদের ভয়ে কারো মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না। শাম্লী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। সিং বাবু ভয়ে জিজ্ঞাস করল তারা কি চায়? এর উত্তরে তারা বলেছিল-

"ঠিক আমাদের শত্রু নও তুমি ব্যক্তিগত ভাবে। তুমি সমাজের শত্রু, তুমি জোঁক, কেবলই রক্ত শোষণ করেছ...... তুমি মহাজন, তুমি সুদখোর, তুমি চালানী, তোমার ডালপালা চারিদিকে ছড়ানো, শোষণের জাল মেলেছ...... তোমার জোঁকের প্রাণ, রক্ত শুষে মোটা হয়েছ, সেই রক্ত ঝরিয়ে দেব আমরা......"৩

তারপর ছদ্মবেশী চারজন মিলে সিংবাবুর গলায় ধারালো কাস্তে চালিয়ে দিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে যায়। তারপর বাড়ির সকলে বেরিয়ে এসে দেখে সিং বাবু গলাকাটা অবস্থায় রক্তাক্ত হয়ে চেয়ারে পড়ে রয়েছে। শাম্লী এই দৃশ্য দেখে ভয়ে ভয়ে কোন রকমে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ির লোকজনের পাশাপাশি পাঠকও অবাক ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। একজন জমিদার সম্পর্কে তাদের মতবাদ সঠিক হলেও হত্যা করা নিয়ে নানা বিতর্ক থেকেই যায়। হত্যাকারীরা লুট করতে নয়, পরিকল্পিত ভাবে সিং বাবুকে হত্যা করেছে। তারা আইনত অপরাধী। নকশাল আন্দোলনের সশস্ত্র প্রতিবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এই ঘটনার মধ্যে। তবে এই ঘটনার পর পাঠক পুনরায় বিস্মিত হয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিক সুকৌশলে পাঠককে একটু একটু

করে ঘটনার অগ্রগতি অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের দক্ষতার প্রশংসা করতেই হয়।
গণপতি সিং খুন হওয়ার পর থেকে চাঁদসোল গ্রামে এক প্রকার ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সন্ধ্যার পরে সাঁওতাল মাহাতো বাগদী পাড়ার লোকজন ঘর থেকে বাহির হয় না। খুনের প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ কারো সঙ্গে আলোচনাও করে না। সিংবাবুর মৃত্যুর পর তাদের রাইসমিল বন্ধ হয়ে যায়। অন্নপূর্ণা বাপের বাড়ি চলে যায়। দুই ছেলে অন্যত্র অবস্থান করেছে। সিং বাবুদের খামারবাড়ি ও রাইসমিল এখন খাঁ খাঁ করে। সিং বাবুদের জমি জমাও পতিত হয়ে পড়ে আছে। গ্রাম ও মাঠ একপ্রকার শ্মশানের মতো নির্জনতা বিরাজ করে। সিং বাবুদের কাছারি বাড়িতে কেউ না থাকলেও তাদের পুরনো সর্দার মহিন্দর দিগার গোশালার একপাশে চাকর বাকরদের থাকার একটি ঘর পড়েছিল। সেখানেই মহিন্দর দিগার ও তার স্ত্রী থাকতো। একদিন অন্ধকার রাত্রে তার সঙ্গে লারান জেলে দেখা করতে আসে। লারান জেলে সিং বাবুদের পুকুরে মাছচাষ ও জাল দেওয়ার কাজ করতো। সেই রাত্রে লারান জানায় সিংপুকুরের মাছ রাত্রিতে চুরি হয়েছে-
"সারারাত মাছ ধরেছে আর সবাইকে বিলি করে গেছে, কেমন সন্দেহ হলো পাড়ায় এসে একটু ঘুরে দেখলাম। দেখলাম দু-চারটে জাল ভিজা ভিজা।"৪
মাছ চুরির বিষয়টা লারাণ যেভাবে বলেছে তাতে করে পাঠকের মনেও সন্দেহ হয়। কে বা কারা এমন কাজ করেছে? এ ক্ষেত্রে মনে হয়েছে কেউ বা কারা ধনীর সম্পত্তি চুরি করে গরিবদের বিলিয়ে দিয়েছে। এই ধরনের কাজ কেন হলো উপন্যাসের পরবর্তী কাহিনী বিশ্লেষণে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে আসার অবকাশ থেকে যায়।
শাম্লীর ভাই পচাই-এর মতিগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সে সাঁওতালদের মতো তীর কাঁড় নিয়ে থাকে। কখনো মুনিষ খাটে, কখনো মেদিনীপুর খড়গপুর চলে যায়। রাতে কখনো বাড়ি ফেরে কখনো ফেরেনা। মোহনের সঙ্গে পচাইয়ের সম্পর্ককে সন্দেহের চোখে দেখে শাম্লী। যেদিন থেকে শাম্লী মোহনকে রাত্রিতে জঙ্গলে ঢুকতে দেখেছিল সেই দিন থেকে মোহনের প্রতি তার একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে এবং মোহন সম্পর্কে তার ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। দুলির মার সঙ্গে শাম্লীর প্রায় দিনই দেখা হয়। দুলির মা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় বলে সে অনেক কিছুই খবর রাখে। শাম্লী তার মুখ থেকে জানতে পারে -
"ইখেনে যেমন সিং বাবুকে কেটেছে, তেমনি উই যে গ সাতবাখরি না কি বলে, সেখানে এক মহাজনকে কেটেছে। এক লুচ্চাকে কেটেছে। সেই হইছে তারক বামুনের ভয়, তাই বউ নিয়ে এসে সাধু সেজে বসেছে।"৫
একদিন স্নান করার সময় শাম্লী মোহনকে একটি পুটুল হাতে নিয়ে মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে শাম্লীও দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একা একা জঙ্গলে গিয়ে মোহনকে তারই সমবয়সী একটি ছেলের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকতে দেখে। ছেলেটি ধুতি ও ফতোয়া পড়ে মোহনের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে উল্টো পথে গ্রামের দিকে চলে যায়। জঙ্গল থেকে ফেরার পথে তারক হালদার শ্‌মলীর পথ আগলে দাড়ায় এবং শাম্লীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বিবস্ত্র করে দেয়। তারকের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ না হলেও শাম্লী বুদ্ধির জোরে তারকের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে মোহনের কাছে গিয়ে মোহনকে জাপটে ধরে। মোহান নিজের গায়ের পোশাক দিয়ে শাম্লীকে ঢেকে দেয়। মোহন শাম্লীর পরিস্থিতি অনুধাবন করে যখন ঘটনাস্থলে হাজির হয় তখন দেখে তারক হালদার শাম্লীর শাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে গাছের ডালে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে। আজ পর্যন্ত তার হাত থেকে কোন মেয়ে ছাড়া পায়নি, শাম্লীকে না ভোগ করতে পেরে অপমানে আত্মহত্যা করেছে। তারেকের আত্মহত্যার ঘটনা বিশ্বাস যোগ্য না হলেও ঘটনার অগ্রগতি ও পরিস্থিতি বোঝাতে ঔপন্যাসিক হয়তো এই কাহিনীর অবতারণা করে থাকতে পারেন। যাই হোক এই ঘটনা শাম্লী ও মোহনকে খুব ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করেছে। এরপর মাথুর

কৌড়ির মধ্যস্থতায় মোহনের সাথে শাম্লীর বিয়ে হয়। বিয়ের ১০-১২ দিন পর মোহন শাম্লীকে নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে চাঁদসোলের আড়াইক্রোশী মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের মাঝে সেই পাহাড়ের মত জায়গায় উপস্থিত হয়, যেখানে মোহন গা ঢাকা দিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই বলাই মোহনকে জানায় বনের মধ্যে দুটো অচেনা লোককে সে দেখেছে। বলাই টহল দেয়ার কথা বলে বেরিয়ে যায়। হঠাৎ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে- “মোহন.. মোহন...কুত্তার দল” এই কথা কানে আসতেই মোহন গুহা থেকে তীর-কাড় নিয়ে গোপন স্থানে চলে যায়। সেই সঙ্গে শাম্লীও কিছু নুড়ি ও বল্লম নিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। মুহূর্তেই সেখানে মিলিটারি চলে আসে, মেলেটারির সঙ্গে মোহনের যুদ্ধ হয় বন্দুক বনাম তীর ও কাঁড়ের যুদ্ধ। বেশি কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর মোহন ও শাম্লী মিলিটারির হাতে ধরা পড়ে এবং মোহনকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। শাম্লীকে অন্যান্য সৈন্যরা ধরে ফেলে। নকশাল আন্দোলনে একসময় প্রেসীডেন্সি কলেজের শিক্ষিত যুবক বিশেষ ভাবে যুক্ত হয়েছিল। তারা নিজেদের পারিচয় গোপন করে গ্রামে গিয়ে প্রান্তিক মানুষদের সংগঠিত কারেছিল এবং চাষের কাজে যুক্ত কারে তাদের স্বার্থ সুরক্ষার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সেই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই মোহন ও বলাই এর মধ্যে। তবে শালবনি উপন্যসের কাহিনি বিশ্লেষণ কারে এ কাথা বলা যায় প্রান্তিক মানুষেরা সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলো না। তারা উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা বিশেষ ভাবে চালিত হয়েছিলেন। মোহনের সঙ্গে ক্যাপ্টেন নরীন্দর সিনহার কথোপকথন থেকে জানতে পারা যায় মোহনের আসল পরিচয় –

“অমলেশ চ্যাটার্জী, সান অব হরদেব চ্যাটার্জী, এ স্কুল টিচার অব চাণ্ডারনাগোর, ইউ আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট অব প্রেসিডেন্সী কলেজ, ফিজিক্স অনার্স, পার্ট ওয়ান ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, সিক্স লেফট্ ইন্ দ্য থার্ড ইয়া... ডু ইউ অ্যামিট?”৬

ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে মোহনের আসল পরিচয় জেনে শাম্লী অবাক হয়। এরপর আরো জানা যায় যে মোহন গণপতি সিংকে হত্যা করেছে এবং মোহন একজন কমরেড তার সঙ্গী বলাই হল কমরেড সুরজিৎ হালদার এই কথাবার্তার মাঝেই ক্যাপ্টেনের ইশারায় তিন চারজন মিলিটারি শাম্লীকে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

“মুহূর্তে নির্দেশ পালিত হতে শুরু করল, শাম্লীর চিৎকার বনটাকে কাঁপিয়ে তুলল যেন, তিনটে জন্তুর আক্রমণের মুখে একটা বিড়ালীর সমস্ত রোঁয়া গুলো ফুলে উঠেছে, সামনে কামড়াচ্ছে, কামড়াবার চেষ্টা করছে শাম্লী, লাথি ছুঁড়ছে। ফাঁকে ফাঁকে ‘মোহন, মোহন...’ বাতাসকে চিরে দিচ্ছে শ্যামলীর তীক্ষ্ণ, আর্ত কণ্ঠ।”৭

মোহন শাম্লীর কাতর আর্তনাদে দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে কিন্তু ক্যাপ্টেন নরীন্দর সিনহার রিভালভার তাক করে মোহনের দিকে গুলি চালায়। সেই গুলিতে মোহন মারা যায় লেখক এর বর্ণনায়-

“তারপর চলে গেল ওরা। চত্বরে পড়ে রইল মোহনের দেহ, আর ঝোপের পাশে ক্রমান্বয়ে ধর্ষিতা, হতচেতন শাম্লী।”৮

এই ঘটনার সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের ছাপ সুস্পষ্ট। এরপর আমরা দেখতে পাই শাম্লীকে মথুর কৌড়ির বাড়িতে নিয়ে রেখেছে পুত্রবধূর মত করে। ঘটনা পরম্পরায় জানতে পারা যায় শাম্লী সন্তান সম্ভবা। এই খবর শুনে মথুর ও তার স্ত্রী গিরিবালা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং তাদের নাতির আগমন বার্তা পেয়ে পুনরায় বুক বাঁধে এবং তাদের একমাত্র ছেলের বজ্রাঘাতের মৃত্যু শোক কিছুটা হলেও লাঘব হয়। মাঠে যে ধান রোয়া হয়েছিল সেই ধানও পাকতে শুরু করেছে। চাষীরা নিজেদের খামারে ধান তোলায় বন্দোবস্ত করেছে। ধান কাটাকে কেন্দ্র করে পুলিশি অভিযান শুরু হয়। গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে পুলিশের দ্বন্দ্ব বাঁধে কিন্তু ধান তোলার কাজ চলতে থাকে। অমলেশ চ্যাটার্জির স্ত্রীকে মথুর তার ঘরে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তার প্রতি পুলিশী নির্যাতন নেমে আসে। এরপর নারান জেলের বিশ্বাসঘাতকতায় পুলিশ মথুরের

ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করে। গণপতি সিংয়ের ছোট ছেলে পুনরায় কারবার শুরু করে অন্যদিকে শাম্‌লীর গর্ভের সন্তান যেন মোহনের আদর্শে বেড়ে উঠেছিল বলে সকলের বিশ্বাস। মোহনের উত্তরসূরী হিসেবে তার সন্তানকে পেয়ে তারা খুশি। মোহন যে আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিল তাকে কোন ভাবেই শেষ করা গেল না। তা যেন আগামীতে প্রবাহমান রইল মোহনের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাধ্যমে সেই বার্তাই ঔপন্যাসিক দিতে চাইলেন।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় নিম্নবর্গীয়রা কখনোই পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় ছিল না। তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য নানা ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কৈবর্ত বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের সক্রিয়তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও উচ্চবর্গের বুদ্ধি ও আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে পেরে উঠতে পারেনি, অকালেই তাদের আন্দোলন সংকুচিত হয়ে যায়। তাহলেও তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ লড়াই উচ্চবর্ণের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। লড়াই এখনো থেমে নেই, বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখায় সেই আন্দোলনের কথা উঠে এসেছে।

গুণময় মান্নার কথাসাহিত্য পাঠ করলে পাঠকের মনে হতে পারে তিনি কোন এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের ভিত্তিতে লিখেছেন কিন্তু যদি সময়ের প্রেক্ষিতে বিচার করা হয়, তাহলে স্পষ্ট ভাবে ধারণা করা সম্ভব যে, তৎকালীন যুগবার্তাকে নিরপেক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তিনি কোন দিনই কোন পার্টির সদস্য ছিলেন না। মার্কসবাদে বিশ্বাসী হলেও মার্কসবাদী দর্শন ও কমিউনিস্টকে কখনোই এক করে ফেলেন নি। তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠলেও সমস্ত উপন্যাসকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের এক ফ্রেমে দাঁড় করিয়ে দিলে তৎকালীন বৃহৎ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১। পার্থপ্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস রাজনৈতিক, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১১

২। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্পা), গুণময় মান্না উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯, পৃষ্ঠা-৩০৮

৩। তদেব, পৃ. ৩১৫

৪। তদেব, পৃ. ৩৩৪

৫। তদেব, পৃ. ৩৩৬

৬। তদেব, পৃ. ৪০৩

৭। তদেব, পৃ. ৪০৬

৮। তদেব, পৃ. ৪০৮

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অমর ভট্টাচার্য, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামান্য তথ্য সংকলন, নয়া ইস্তেহার প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ ২০০২

২। নির্মল ঘোষ, নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮২

৩। প্রলয়দেব মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্র ও রাজনীতি, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ ২০১৯

৪। ফটিকচাঁদ ঘোষ, নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২

৫। রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের আবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,

কলকাতা, ২০০৫
৬। সুবল সামন্ত, (সম্পা), গুণময় মান্না সংখ্যা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, শারদীয় ১৪১৭

CC BY NC

.